আচার্য সুশীলকুমার দে ঃ জীবন ও সাধনা

অশোককুমার রায়

আচার্য ডক্টর সুশীলকুমার দে'র শিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অনন্যমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং গভীর চিন্তা করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, চাকলা, পুরাতত্ত্ব সর্ব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও স্বকীয় মননশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর রচনার মধ্যে। তিনি আধুনিক যুগের এক পরম বিস্ময়। তাঁর রচনার কিছু অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন ইংরাজি, বাংলা সাময়িকপত্রের পাতায় লুকিয়ে আছে। অপ্রকাশিত বহু লেখা এবং কয়েকটি গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি টাইটেল পেজ সহ বাঁধানো অবস্থায় তাঁর টেবিলে আমি দেখেছিলাম তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগেও। জানিনা, তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেগুলি রক্ষা করেছেন কিনা!

যৌবনেই সুশীলকুমার জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অনন্যমন হয়ে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ব্যাপী চিন্তন ও মনন তাঁর গভীর উপলব্ধির স্বাক্ষর দেয়। ক্রমে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁর অখণ্ড মহাযোগের তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা, গবেষণা, আলোচনার মধ্যে দিয়ে জীবনের, সমাজের তথা সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা বিরল। মনে হয় তাঁর দর্শন ও জীবনাদর্শ বর্তমান ও ভবিষ্যত মানবজাতিকে প্রজ্ঞালোকিত জীবনের পথনির্দেশ করবে। এইজন্যই তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানা যায় ততই মঙ্গল। তাই এই রচনাপঞ্জিটির প্রয়োজনীয়তা তঁারাই উপলব্ধি করবেন যাঁরা আচার্যদেবের অবদান নিয়ে গবেষণা করতে, চিন্তা - ভাবনা করতে ও আনন্দের সন্ধান পেতে চান।

জ্ঞান ও সাধনা অনেক সময় একে অপরের প্রতিকূলতা করে থাকে। শুষ্ক জ্ঞান শুধু সংগ্রহ মাত্র। যে জ্ঞান সাধ্য- সাধনার আয়ত্তাধীন নয় তাতে বিষয়ী ও সাংসারিক লোকের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু যে জ্ঞান পরাবিদ্যা ও অপরা - বিদ্যাকে একত্র সমন্বিত করে তা যথার্থই মুক্তির পথে নিয়ে যায়। আচার্য সুশীল-কুমার তারই মূর্ত বিগ্রহ। তিনি জ্ঞানের এক অত্যুচচ ভূমিতে আরোহন করেছিলেন, কিন্তু সে জায়গায়ই তিনি থেমে থাকেননি। জ্ঞানার্জন উপলব্ধির সোপান মাত্র। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেবমন্দিরে পৌঁছতে হয়। জ্ঞানের দ্বারা যে সাধনালোকে উত্তরণই জীব জীবনের উদ্দেশ্য সুশীলকুমার ছিলেন সেই পথেরই পথিক।

সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলায় যেমন ছিল তাঁর অনায়াস অধিকার তেমনি রচনা করেছিলেন অজস্র প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা ও গবেষণা নিবন্ধ। বলতে গেলে প্রবন্ধগুলি মানব মনীষার এক অভূতপূর্ব বিস্ময়। কিন্তু এগুলির অনেকটাই সাময়িক পত্রে বা নানা গ্রন্থের ভূমিকা বা স্মারকগ্রন্থের জন্যে বিশেষভাবে লেখা; বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে বলে তত্বজিজ্ঞাসু ও গবেষকগণ সেগুলিকে প্রয়োজনের সময়ে হাতের কাছে পান না। এইজন্য তাঁর যাবতীয় রচনায় একটি তালিকা বা নির্ঘন্টের প্রয়োজন ছিল। কাজটি অতিশয় শ্রমসাধ্য ও দুরূহ হলেও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার দ্বারাই এই তালিকা প্রস্তুত করেছি। পাঠকগণ এই তালিকা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন এই মনীষীর চিন্তার সমুদ্র কত রত্নরাজিতে সমৃদ্ধ। আশাকরি তালিকাটি তত্ত্বিক, গবেষক, জিজ্ঞাসু পাঠক সকলেরই উপকারে লাগবে।

সুশীলকুমারের পারিবারিক জীবন ছিল আভিজাত্যে - সংস্কৃতিতে যেমন গৌরবময় তেমনি স্নিগ্ধ। পিতামহ নীলমণি দে (১৮৩৭-১৯২৬) ছিলেন হুগলী জেলার পাউনানের সম্ভ্রান্ত দে পরিবারের মধুসূদন দের একমাত্র সন্তান। জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউশনের(বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যাপক অগিল্‌ভি ও মেট্রোপলিটনের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হিসেবে তিনি সেকালের উচচশিক্ষিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশনের দপ্তরে কলকাতার রেজিষ্ট্রার ছিলেন।কাশীপুর - চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার ম্যান

পদেও বহু বছর পৌরসভার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় বা কর্মজীবন পরিত্যাগের পরে তিনি কোনদিন বিদ্যাচর্চা পরিত্যাগ করেননি বা কর্মজীবন পরিত্যাগের পরে তিনি কোনদিন বিদ্যাচর্চা পরিত্যাগ করেননি এবং ইংরা জিনবিশ সুপণ্ডিত ও সুলেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'ক্যালকাটা রিভিউ' ও অন্যান্য স াময়িক পত্রেও তিনি বহু বিষয় প্রবন্ধ রচনা করেন। সেকালের প্রসিদ্ধ দেশনায়ক, বাগ্মী, লেখক ও সমাজ সংস্কারক কিশে ারী চাঁদ মিত্রের(১৮২২ - ১৮৭৩) একমাত্র সন্তান কুমুদিনীর (১৮৩৩-১৮৯) সঙ্গে নীলমণি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের সাতটি পুত্র ও চারটিকন্যার জন্ম হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ নববই বছর বয়সে নীলমণির মৃত্যু হয়। চতুর্থ সন্তান তথা দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র (১৮৬৯-১৯৪৯) ছিলেন বহু বিদ্যায় পারঙ্গম এক প্রতিভাবান মানুষ। মেট্রোপলিটন ইননষ্টিটিউশনে পাঠকালে তিনি ও তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা (তৃতীয় পুত্র) কিরণচন্দ্র (১৮৭১-১৯৪৩) বিদ্য াসাগরের নয়নের মণি ছিলেন। এই বিদ্যালয় থেকেই ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষার উভয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হয়ে সতীশচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ও কিরণচন্দ্র ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট অ র্টস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। উভয় ভ্রাতাই বি.এ. পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে (ইংরাজি, গণিত ও বিজ্ঞান) অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এঁদের কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র (১৮৮৩-১৯৪৩) (পরবর্তীকালে ডিষ্টিক্ট এণ্ড সেসন জজ) প্রথম স্থান অধিকার করে অনুরূপ বিদ্যাখ্যাতি অর্জন করেন। বি.এ. পরীক্ষার পর সতীশচন্দ্র কলকাত ায় মেডিকেল কলেজে এবং কিরণচন্দ্র কেমব্রিজ ৰিবিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। সতীশছন্দ্র সকল বৃত্তি, দশটি সুবর্ণপদক ও আটখানি সার্টিফিকেট অব্ অনার লাভ করে ফাইনাল এম. বি. পরীক্ষার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান ও রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান (১৮৯৪) এবং কিরণচন্দ্র আই. সি. এস. 'পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার (১৮৯৩) করেন। পরবতীকালে সতীশচন্দ্র বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস ও কিরণচন্দ্র Commissioner Presidency Division, Burdwan, Division, Chittagong Division, Member Board of Revenue প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

সতীশচন্দ্রের অন্যান্য ভ্রাতারাও ৰিবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। এই রকম আ ভিজাত্য, বিদ্যাগৌরব, কর্মশক্তি ও দীর্ঘ আয়ুর উত্তরাধিকারী হয়ে সুশীলকুমার তাঁর উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দো) কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী বিশিষ্ট সমাজনেতা ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার সাতকড়ি মিত্রের পৌত্রী ও ভারতের চা শিল্পের অন্যতম প্রাণপুষ ভোলনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ কন্যা সুভাষিণী দেবীর (১৯০২-৬২) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তাঁদের একমাত্র সন্তান সুধীরার জন্ম হয়। সুধীরা বাল্যাবধি নানা পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতেন। মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় তাঁর অনেক গল্প কবিতা ও অনুবাদ কাহিনী প্রকাশিত হয়। জনৈক গৃহস্থবধূর ডায়েরী (কিশোরী- চাঁদ মিত্রের সহধার্মিণী কৈল াসবাসিনী দেবী লিখিত আত্মজীবনী) মূল লেখাটি জ্ঞাতব্য তথ্য এবং পরিচিতি সহ মাসিক বসুমতীর পাতায় প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ৩রা শ্রাবণ ১৩৩০) খিদিরপুর নিবাসী ভূতপূর্ব মেয়র ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সন্তে াষকুমার বসু অগ্রজ পূর্বতন বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের অংশীদার সরলকুমার বসুর একমাত্র পুত্র অণকুমার বসু অ াই.আর.এস - এর সঙ্গে সুধীরা দেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই উপলক্ষে একটি বিবাহ স্মরণিকা প্রকাশিত হয় যার মধ্যে সজনীকান্ত দাস ও মোহিতলাল মজুমদার দুটি দীর্ঘ কবিতা (প্রায় তিন পৃষ্ঠা করে যথাক্রমে ''হরগৌরী ও ''কন্যা প্রশস্তি'') লেখেন। যতদূর জানি এই কবিতা দুটি তাঁদের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অশেষ যন্ত্রণা ভোগের মধ্যে দিয়ে সুধীরা দেবীর দেহাবসান হয়। সুধীরা ও অণকুমারের একমাত্র পুত্র সঞ্জীবকুমার টি ট্রেডিং কর্পো ারেশনের জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন এবং একমাত্র কন্যা কৃষ্ণা প্রখ্যাত বৈজ্ঞা নিক, কলকাতা ৰিবিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও খড়গপুরস্থ ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডাইরেক্টর ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পুত্র এ কে ঘোষ (ডাইরেক্টর ইণ্ডিয়ান এ্যালম্যুনিয়ম লিঃ) - এর সহধর্মিণী।

অশেষ গুণশালিনী একমাত্র সন্তান সুধীরা দেবীর মৃত্যুর পর সুশীলকুমার ও সুভাষিণী দেবী এতদূর শোকগ্রস্ত হন যে তাঁদের উভয়ের শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি অল্প কয়েকদিনের জ্বরে সুভাষিণী দেবী ও ৩০শে জানুয়ারি সুশীলকুমার লোকান্তরিত হন। তার পরও সুশীলকুমারের

জননী অন্নপূর্ণা দেবী নববই - উধর্ব জীবন কাটিয়েছেন১৯/এ, চৌধুরী লেনের বিশাল ভবনে নাতজামাই অণকুমার বসুর প্রত্যক্ষ সেবায় যত্নে আরো চার বছর। তবে তখন কোন দুঃসংবাদই গ্রহণ করার মত স্মৃতিশক্তি তাঁর আর ছিল ন া।

নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা বা প্রচারের জন্য লেখায় বা কোন সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয়ে সঙ্কোচ ছিল আকৈশোর সুশীলকুমারের। তবু দীর্ঘজীবনে কখনো তাঁর কৃতি ছাত্রেরা, কখনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরাগীবৃন্দ তাঁর একান্ত অনিচ্ছায়ও ও তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনা তথা নানা দুরূহ বিষয়ের গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করেছেন বিশ্বের নানা সারস্বতপত্রে। বাংলা সাময়িকপত্রে এমনি ধরনের কোন উদ্যোগে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশেষ স্নেহধন্য দু'একজনের মাধ্যমে সামান্যই কিছু প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত জীবনে আমি আজন্ম তাঁর স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করলেও উচচশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিষয় হওয়ার কারণেই হোক আর নিজেরবিষয়ের আলোচনা পছন্দ নয় বলেই হে াক, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হয়েছেন অথবা মুখ্য গবেষণাপত্রগুলি কোন কোন পত্রিক ায় প্রকাশিত হয় ইত্যাদি থেকে শনিমণ্ডলীর অন্যতমরূপে কিছু স্মৃতিচারণ ... সকল বিষয়েই ছিল কেমনএক ধরনের অন াসক্তি । তিনি বলতেন। "আমার কথা কি-ই বা আছে জানবার। ভবভূতি, ভাস, বাণভট্ট, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, হোম ার, ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপীয়র -- ভাবো এঁদের ঐশ্বর্যও জীবনসাধনার কথা।"

তাই দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মাত্র ৩০ বছরের মধ্যেই তিনি মৃত্যু শতবর্ষ অতিক্রান্ত মানুষের চেয়েও অনেক বেশি দুষ্প্রাপ্য হয়েছেন ভাগ্যের পরিহাসে। ১৯৬৮র ৩০শে জানুয়ারির কাকভোরে সবার আগেই হাজির হয়েছিলাম তাঁর প্রাণহীন দেহের পাশে। তখনও তাঁর সুবিশাল বাড়ির প্রতিটি ঘর জুড়ে ছিল দশ সহস্রাধিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। তাঁর গ্রন্থাগ ারের ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থসংগ্রহ ও নানা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-গুলি বর্থমানে পুণার ভাণ্ডারকর ইনষ্টিউটকে দান করে য ান। কিন্তু বাংলা গ্রন্থ ও লিখিত রচনাদির পাণ্ডুলিপি, দিনলিপি, পত্রাবলী, আলোকচিত্রাবলী, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন তথা সাহিত্য জীবনের অসংখ্য তথ্যাবলী ছিল অত্যন্ত গোছানো অবস্থায় তাঁর ১৯/এ চৌধুরী লেনের বাসভবনে। স ম্প্রতি বাড়িটি প্রোমোটারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই ডঃ দের স্মৃতিবিজড়িতসেই বাড়িটি ও তঁ ার সখের বাগানের নানা দুষ্প্রাপ্য গাছপালার আর কোন চিহ্নই থাকবে না। বই, কাগজপত্র, আলোকচিত্রের অ্যালব াম, চিঠিপত্র ইত্যাদি দীর্ঘদিন দারওয়ানদের হেপাজতে থাকা খালিবাড়ি থেকে কেউ জানে না কেমন করে কোথায় হা রিয়ে গেছে।

পরলোক গমনের মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যেই আচার্য সুশীলকুমার দে বান্ধবহীন ও পাঠকদের দৃশ্যপট থেকে একরকম অগোচরেই চলে গেছেন। অন্তত আমার ধারণা তাই। তবে সুশীলকুমার বেঁচে থাকতেও কি শেষের দশবছর প াঠককুলের গোচরে ছিলেন? এমন একটি প্রশ্ন মনে দানা বাঁধে বৈকি! যিনি আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের দুশ্চর তপস্য ায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন প্রতিদানের সামান্য প্রত্যাশা না করে, এমন একজন ঋষির প্রতি তাঁর কাছের ম ানুষগুলির নীরবতা ও নির্লিপ্ত ব্যবহার বাস্তবিক অদ্ভুত মনে হয়। দৈনিক তথা মাসিক বাংলা সাময়িক পত্রিকায় তাঁর দেহত্যাগের খবরটি পৌঁছে দিয়ে ওঁরা দায়িত্ব পালনের শিষ্টাচারটি রক্ষা করেছেন, এ কথাটি অবশ্যই মানতে হয়।

এই সজ্জন, কৌতুকপ্রিয়, মৃদুভাষী, অভিজাত অন্তরের মানুষটির অভ্যন্তরে তাঁর যত ক্লেশ ও মনঃক্ষোভ অতি সন্তর্পণে আড়াল করে অপরের বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে গেছেন, বানানের যত ধন্দের সমাধান করেছেন অতি সহজেই কাব্য বিচ ার তথা ছন্দের গোলক ধাঁধায় যাঁর ছিল অবাধ বিচরণ, মানুষ গড়ার কাজে যিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী, বাংলা ভ াষা ও প্রাচীন সাহিত্য (বিশেষত পুঁথির পাঠ ও তার কাল নির্ণয়ের অভ্রান্ত নির্দেশক রূপে) বিষয়ক জটিল দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রন াথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তরঞ্জন, বিদ্বদ্বল্লভ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাজ্ঞজন যাঁর পরামর্শ গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করতেন না, সর্বোপরি 'অমশতক' - এর সাবলীল মূলানুগ অনুবাদ (১৩৩৯), টীকা - টিপ্পনীসহ রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী', (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১), লীলাশুক বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম (ঢাক া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৫), Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal (ঢাকা বিশ্ববিদ্য ালয়, ১৩৪৯), Contribution to Sanskrit Literature and Studies in Bengal Vaisnavism [196] প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক সব অসাধারণ গ্রন্থ রচনার ফলে প্রাচীন সাহিত্য গবেষণার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। কেবল

বিশ্বাসে নয়, পাণ্ডিত্য এবং তর্কেও যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তা সুশীল - কুমার তর্কাতীতভাবে দেখিয়ে দেন। তিনি বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্পর্কে গবেষণার নতুন ধারার প্রবর্তক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র, কাব্য, নাটকই তাঁর ব্যাপক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি উপলব্ধি করেন বৃন্দাবনের যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়, তার মূলে ছিল হিন্দুধর্মের বৃহত্তর ঐতিহ্য এবং অতি উচ্চতাঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায়ও সুশীলকুমারের যে সুগভীর জ্ঞান ছিল তা এই সঙ্গে মুদ্রিত তাঁর বিস্তৃত রচনাপঞ্জির দিকে দৃষ্টি দিলেই পাঠকও অনুভব করবেন। সুশীলকুমার শুধু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস লেখেননি, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে জিজ্ঞাসামূলক কিছু মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, এবং অনুশীলন যেমন গভীর ও ব্যাপক তেমনি তার প্রতিটি বিভাগেই তাঁর সফল উত্তরণ এক অবিস্মরণীয় সংযোজন।

সুশীলকুমারের জীবনের প্রায় চবিবশ বছর (আগস্ট, ১৯২৩-জুন, ১৯৪৭) কাটে তৎকালীন মফস্বল নগরী ঢাকাতেই। অর্থাৎ তাঁর কর্মজীবনের বড় অংশটিই কাটে আজকের ওপারে বাংলায়, যেখানের অনেক পত্রপত্রিকায়ই সে সময়ে তিনি লিখেছেন যার সন্ধান এপার বাংলায় বসে বোধহয় সম্পূর্ণ হবে না। ঢাকার সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব হয়তো নেই, কিন্তু আছে রাজনৈতিক ধন্দ -- একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি রাষ্ট্রের প্রোটোকলের ব্যাপারটাতো অস্বীকার করা যায় না; যে কারণে কোন কিছুই নয় সহজলভ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'লণ্ডন' ও 'বন' বাসকালে তাঁর কিছু প্রবন্ধ সে দেশের পত্রিকায় প্রকাশের উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গেলেও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড-এর ভল্যুমগুলি সম্পূর্ণ দেখতে পেয়েছি কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে। যাইহোক এই কলকাতায় অপটু হাতে অনেকটা দেরীতে এই যা লাভ হল মন ভরল কোথায় - কোথাও মস্ত ফাঁক রয়ে গেল । যাঁরা তাঁর জীবন ও গবেষণা তথা সাহিত্যসাধনার অনেক 'তথ্য', অনেক সন্ধান দিতে পারতেন আজ তাঁরা প্রায় সকলেই পরলোকগত।

সুশীলকুমার দে সম্পর্কে এপর্যন্ত সমীক্ষা সমালোচনা যা হয়েছে, তার অধিকাংশই অ্যাকাডেমিক আলোচনা জাতীয়। আর কিছুব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। কিন্তু জীবন-ভিত্তিক আলোচনা ও প্রায় ষাট বর্ষ ব্যাপী তাঁর বাংলায় ও ইংরাজিতে লিখিত বিবিধ বিষয়ের গবেষণা নিবন্ধ, মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি ছড়িয়ে আছে কত জানা - অজানা সাময়িকপত্রের পাতায় ও স্মারকগ্রন্থে তার একটি সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জিরপ্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে একদিকে যেমন কোথাওই কোন পত্রপত্রিকার সব ক'টি সংখ্যা নেই, তেমনি কোন পাবলিক লাইব্রেরীর সুউচ্চ বুক সেলফে তার অবস্থান অজুহাতে আজ নয় কাল করে দেখতে দিতেও অনীহা যে কোন পরিশ্রমী মনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। এখানে আমরা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকাটি সম্পূর্ণ করতে পারলেও সময়িকপত্রে প্রকাশিত ইংরাজি ও বাংলা রচনাপঞ্জি যতখানি সংকলন করতে পেরেছি তাকে 'সম্পূর্ণ' বলে কখনই মনে করছি না। 'বলাবাহুল্য এই রচনাপঞ্জি নির্বাচিত নয়। কোনবাধা বিঘ্নই যেহেতু আমাকে নিৎসাহিত করে না তাই আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে এই রচনাপঞ্জি সংকলনের কাজ শেষ করে গ্রন্থাকারে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারবো।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে যে কজন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, আচার্য সুশীলকুমার দে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি এই প্রতিভাধর পুষের জন্ম হয়, মুখে রূপোর নয় সোনার চামচ নিয়ে। অভিজাত বংশে জাত সুশীলকুমার ছিলেন তাঁর পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক স্বর্গত সতীশচন্দ্র দের একমাত্র সন্তান। ধনীর ঘরের একমাত্র সন্তান সুখ - স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত হলেও লেখাপড়ায় ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। সারাজীবন অনন্যসাধারণ মেধারই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলিজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ সালে বৃত্তি সহ তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই ১৯০৭ সালে প্রথম বিভাগে বৃত্তি সহ ফার্স্ট আর্টস ও ১৯০৯ সালে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। পরের বছর ১৯১২ সালে প্রথম শ্রেণীতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তিসহ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরের বছর ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯১২-১৩) পদে যোগদান করেন। এরপর ১৯১৩-১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপনা করেন এবং ১৯১৯ সালে ভারতীয় ভাষার (প্রধানত বাংলা) এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ১৯১৫ সালে তিনি গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার পান এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংল

া সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯১৭ সালে লাভ করেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। কলকাত া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৩ পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর তিনি ঐ বছরেই (নভেম্বর, ১৯২৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে বিভাগীয় প্রধান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আহ্বানে সুশীলকুমার সংস্কৃত বিভাগেও রীডার পদে যোগদান করেন। হরপ্রসাদের অবসর গ্রহণের পর সুশীলকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ব াংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইংরাজি বিভাগ থেকে সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধানরূপে কাজ করার সুযে াগে সুশীলকুমারের সংস্কৃত চর্চার বিশেষ সুবিধা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার সময়ই পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অনুরোধে সুশীলকুমার কিছুকাল ছুটি নিয়ে পুণায় থেকে মহাভারতের দ্রোণ পর্ণ ও উদ্যোগ পর্ব তিন খণ্ডে সম্পাদন করেন। তখন অনেকেই সংস্কৃত বিভাগের উচ্চতম পদে এই "বিলাত ফেরৎ অর্বাচীন ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ" ব্যক্তিকে নিযুক্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনেক কটুক্তি ও পরিহাস করেছিলেন। সুশীলকুমার অবশ্য অচিরেই তাঁর নিয়োগের সার্থকতা সপ্রমাণ করেছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি একদিকে যেমন অধ্যাপনার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, অপরদিকে তেমন স্বয়ং গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত থেকে ছ াত্রগণকে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর অনেক ছাত্র 'গবেষক' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অলঙ্কার শাস্ত্র ছাড়াও কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন করে তিনি বহু অমূল্য গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধে রচিত বিশাল গ্রন্থ সুশীলকুমারের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের অন্যতম নিদর্শন। ভারতীয় ও বৈদেশিক পত্রপত্রিকায় কত যে তাঁর গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ - নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি রচনার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে? তাঁর সেইসব উচ্চাঙ্গের গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ পদে বৃত হয়েছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় সংস্কৃত কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনি বসু স্বর্ণপদক (১৯৪৮), ঢাকার সারস্বত সমাজ কর্তৃক বিদ্যারত্ন উপাধি (১৯৪৩), রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক সম্মানিত ফেলো (১৯৫৪), অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের সভাপতি (৫ম অধিবেশন, বোম্বাই, নভেম্বর, ১৯৪৯), বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য (১৯৫৫), নবদ্বীপের বিবুধজননী সভা কর্তৃক বিদ্যাসিন্ধু (১৯৫০) (১৯৫৬), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাদান (১৯৫০), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিটির সদস্য, সংস্কৃত কলেজে গবেষণা বিভাগ গঠনের জন্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান (১৯৪৮), ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত সংস্কৃত অভিধান রচনা বোর্ডের সভাপতি (১৯৫৫), ভিজিটিং প্রফেসের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভ ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (অক্টোবর, ১৯৫১ - সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) প্রভৃতি কত প্রতিষ্ঠানেই না তিনি যুক্ত থেকে তাদেরই সম্মানিত করেছেন। অধ্যাপক হিসাবে গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন দেশেরও বিদেশের সবচেয়ে নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির -- যেখানেই সংস্কৃত, বাংলা তথা ভারত তত্ত্বের ওপর মৌলিক চিন্তা গবেষণানির্ধারণ করতে হয়েছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পরে সুশীল কুমার প্রথমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গবেষণা বিভাগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক রূপে ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাক্ষের ও ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টস এর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যাবদপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আমৃত্যু তাঁর সারস্বত সাধনা অব্যাহত ছিল। এই সময় যদিও তাঁর শরীর ভাঙতে শু করে এবং অনেক প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক পান তবুও তারই মাঝে গভীর নিষ্ঠায় অনলসভাবে তাঁর গ্রন্থগুলির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন।

তাঁর নিজের বিষয় অলঙ্কার শাস্ত্র হলেও তিনি পুরাণ, স্মৃতি, নাট্যসাহিত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি নানা শাখায় ছ াত্রগণকে গবেষণায় পথনির্দেশ ও 'তথ্য'র সন্ধান দিয়ে বহু বিষয়ের কাজকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন নিঃশব্দে।

মানুষ হিসাবে সুশীলকুমারের সম্যক পরিচয় হয়তো অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। উনিশ শতকের মননশীল অভিজাত স ম্প্রদায়েরসংস্কৃতি যেন মূর্ত হয়েছিল। এই জ্ঞানতাপসের মধ্যে সূক্ষ্ম চিবোধ তাঁর কথায়, বেশভূষায় ও আচার- অ াচরণে ছিল প্রকট। মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারী ও সুসজ্জিত এই মানুষটি সহজেই লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতেন।

চরিত্রের যে দৃঢ়তা যুগে যুগে প্রশংসিত হয়েছে, তা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়েছিল এই মনীষীর মধ্যে। স্বয়ং গুণবান সুশীলকুমার গুণের মর্যাদা দিতে জানতেন এবং এজন্য প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করার সৎসাহস তাঁর ছিল। স্বর্গত চাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ১৯৩৮) ও স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮ - ১৯৫২) -এর প্রদীপশিখাকে তিনি স্ফুলিঙ্গ অবস্থায় লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের ঢাকা ঝিবিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদে। সুশীলকুমারের আনুকূল্য এই দুই পণ্ডিতের প্রতিভার স্ফুরণে অনেক পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। অথচএই নিয়োগের জন্য সুশীলকুমারকে একদিকে ঝিবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ও অন্যদিকে সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের একাংশের বিরোধিতা -- সমালোচনাও তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। অপরাধ, এঁরা উভয়েই বি.এ. পাশ ছিলেন। অর্থাৎ ঝিবিদ্যালয়ে পড়ানোর ন্যূনতম মাপকাঠি যেখানে এম. এ. তা তাঁদের ছিল না।

তাঁর ছাত্রবাৎসল্যের কথা তাঁর বিভিন্ন কৃতি ছাত্রেরা কৃতজ্ঞচিত্তে লিখে গেছেন তাঁদের লেখায়। গবেষণার দুরূহ পথে কত ছাত্রছাত্রীকেই যে তিনি হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না।

রচনাশৈলী যে রচয়িতার চরিত্রের ইঙ্গিত দেয় সুশীলকুমারের জীবনে শু থেকেই তা লক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তঁার যে সংযন, পরিমিতিবোধ ও বিচার - বুদ্ধি দেখা গিয়েছে, তার প্রতিফলন তাঁর রচনার শব্দ ব্যবহারে, বাক্যগঠনে ও বিন্যাসে সর্বত্র পাওয়া যায়। তাই তাঁর লেখায় উচ্ছাস বা আবেগ প্রবণতা নেই, আছে যুক্তিজাল ও প্রমাণপঞ্জি। কেউ কেউ তাঁর লেখার সমালোচনা করে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি মস্তিষ্ক দিয়ে লেখেন, হৃদয় দিয়ে নন। তাঁর এবংভূত রচনাই দেশে - বিদেশে, উচচ প্রশংসা লাভ করেছে।ধবনিত হয়েছে দেশীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের কণ্ঠে তাঁর লেখার প্রশংসা; বলেছেন এতে সাউণ্ডনেস অব লিটারারী জাজমেন্ট ও এবিলিটিঅব্ এক্সপ্রেশন আছে সর্বত্র অনবদ্যভাবেই।

মনে হয় সুশীলকুমারের অধ্যাপনা জীবনের সর্বাধিক সার্থকতা নিজের একনিষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা ছাত্র গঠনের উদ্দীপনা; তাঁর জ্ঞানদীপ থেকে অনেক দীপ তিনি প্রজ্বলিত করে গিয়েছেন। তিরিশ বছর আগে এই মনীষীর লোকান্তর গমনে বাংলার তথা ভারতেরবিদগ্ধ সমাজের যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, কোনদিন তার পূরণ হবে কিনা কে জানে।

সুশীলকুমার আজ আর সশরীরে আমাদের সামনে উপস্থিত নেই। তাঁর অশরীরী বাণী যে বারংবার ধবনিত হচ্ছে --- তেজস্বিনাবধীতমস্তু।